ডিকনস্ট্রাকশন বিষয়ে দু-একটি কথা, যা আমি জানি

দেবাশিস সরকার

কোনো এক শীতের বিকেলে দুর্গাপুরের কোনো একটি এলাকায় তিনজন মানুষ হাঁটছে, একজন এন আর আই ভদ্রমহিলার সাময়িক আস্তানার উদ্দেশে। সেই শীতের বিকেলে সূর্যের পড়ন্ত আলো, রাস্তার দু - পাশে সামাজিক বনসৃজনের উইক্যালিপটাস বীথি থেকে ঝরে পড়া পাতা, ডিডি সেভেনের কোনো জনপ্রিয় সিরিয়ালের টাইটেল মিউজিক, স্বাস্থ্যোদ্ধার - অভিলাষী বৃদ্ধ — বৃদ্ধাদের পদচারণা — ইত্যাদি যা যা থাকবার, সবই রয়েছে। আমরা সেসব ডিটেইলসে যাব না। আমরা বরং এই তিনজন চলমান মানুষ ও একটু পরে সেই এন আর আই ভদ্রমহিলা, এদের কথোপকথন থেকে উঠে আসা কিছু প্রশ্ন বুঝে নিতে চেষ্টা করব।

চলমান মানুষ তিনটির একজন — দেবাশিস, চল্লিশ পেরোনো অতি সাধারণ, পাতি কেরানিসুলভ চেহারা। কাজ করে একটি রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্কে। আর্থিক নিরাপত্তা প্রায় নিশ্চিত, তাই পত্র - পত্রিকা পড়ে, চারাগাছে সাজানো - গোছানো জল ঢালে, জাতীয় সংহতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধের কথা বলে, রামায়ণ - মহাভারত - উপনিষদের পৃষ্ঠাসংখ্যা কত তা জানিয়ে তাক লাগিয়ে দেয়। ও গল্পকার হতে চায়, উচ্চ-ফলনশীল গল্পের খোঁজে তক্কে তক্কে থাকে।

দ্বিতীয় মানুষটি কানন। ও দেবাশিসের সহকর্মী। ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্ম, পাড়ার লোকের নানাবিধ সমস্যা, এলাকার মোড়লের গা ঘেঁষে থাকা — ওর পছন্দের বিষয়। পঞ্চাশের নীচে বয়েস। ও চায় — প্রতিটি মানুষ যেন ইস্কাপনকে ইক্কাপন বলেই ডাকে।

তৃতীয় জন সুরেন বকশি। পঞ্চাশের নীচে বয়েস, ক্ষয়াটে, কালচে মেরে যাওয়া চেহারা। এই এলাকা থেকে কুড়ি মিনিট দূরের হাঁটা রাস্তা পেরোলে ওদের কারখানার ছিল, এম এ এম সি। কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার সময় সে সামান্য কিছু টাকা পায়, তার কিছুটা দিয়ে একটা ঝুপড়ি বানিয়েছে এই এলাকার কাছেই। সেখানেই বউছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই, রোজগার না থাকলে বোধহয় তা হয়, কেমন মিয়োনো, নিষ্প্রভ উপস্থিতি।

কানন বলল, 'দেবাশিস, আমি তো গল্প - টল্প লিখি না, তবে এই ভদ্রমহিলার জীবনে এত ওঠাপড়া, এত সমস্যা যে আলাপ করলে বুঝবে এনার জীবন গল্পকেও হার মানায়। দ্যাখো, তুমি যা খুঁজছ পাও কি না, লেখা হলে আমাকে পড়িয়ো। দেখি, তোমার কোনো কাজে লাগতে পারি কি না, আসল উদ্দেশ্যটা অবশ্য সুরেনদাকে কাজটা পাইয়ে দেওয়া। চলে, দেখা যাক। ডানদিকের তিন নম্বর বাড়িটা।'

কলিংবেল বাজতে রোগা, ক্ষয়াটে চেহারার এক ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন। উচ্চতা টেনেটুনে পাঁচ ফুট হবে বোধহয়, পরনে একটা সাদা গাউন, সুতির। ক্ষয়াটে চেহারার জন্যে নাকি গাউন পরে থাকার জন্যে দেখতে কুশ্রী লাগছে ওনাকে। শাড়ি পরে থাকলেও বোধহয় ঠিক ছিল, দেবাশিসের সেইরকমই মনে হল।

ভদ্রমহিলা নমস্কারের ভঙ্গি করে বলে উঠলেন, 'ওয়েলকাম টু মাউ হাউস। কানন, ইনট্রোডিউস করিয়ে দাও।'

কানন বলল, 'এ হচ্ছে দেবাশিস, আমার কলিগ। লেখে - টেখে। ওকে অনেকদিন আগেই আপনার কথা বলেছি, ও তখনই আসতে চেয়েছিল। আজ তো সুরেনদাকে নিয়ে আপনার কাছে আসার কথা ছিলই। দেবাশিসকে বলতে ও - ও চলে এল। আর, এই হচ্ছে সুরেনদা। আপনার ফুড - সাপ্লায়ার।'

দেবাশিস বলল, 'নমস্কার মাসিমা। এই সুরেনদার সঙ্গে আপনার কথা শেষ হয়ে গেলে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করব, আপনার আপত্তি নেই তো।'

—নট অ্যাট অল, মাই বয়। ইউ ক্যান অ্যাড্রেস মি অ্যাজ অমিয়া, ইফ ইউ প্লিজ। এই মাসিমা - টাসিমাতে আমি ঠিক ইয়ে — ওই হ্যাবিট হয়ে যাওয়াকে কী বলে যেন?

—হ্যাবিচ্যুয়েটেড।

—ওহ্ নো। বাংলাতে?

—অভ্যস্ত।

—ইয়া! অভ্যস্ত। কতকাল পরে শুনলাম। 'মাসিমা'টা এখানে আসার পর থেকে রোজই দু-চার বার শুনি অবশ্য। যাক গে— দেবাশিস, আই হোপ ইউ আর ম্যারেড।

—হ্যাঁ, মাসিমা।

—গুড। আর আপনিই বোধহয় সেই গুডম্যান যিনি আমার খাওয়ার দায়িত্ব নেবেন। আপনার নাম?

—সুরেন বকশি।

— গুড। আসুন। ভেতরে আসুন। বসে কথা বলি।

ভেতরে ঢুকে একটা সোফায় ওরা তিনজনে বসলে, উলটো দিকে একটি প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে ভদ্রমহিলা মুখোমুখি বসলেন। বললেন, 'সো, মিস্টার সুরেন! আই হোপ, কানন আপনাকে এভরিথিং বলেছে।'

কানন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না মাসিমা, স-ব বলতে শুধু বলেছি দু-বেলা চা, টিফিন আর দুটো মিল তৈরি করে দিতে হবে। কিন্তু, কত টাকা আপনি দেবেন, মিলের সঙ্গে কী কী তরকারি থাকবে, এ সমস্ত আলোচনা আপনারা করে নিন। এই সুরেনদারও কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ওদের কারখানা বন্ধ হবার ফলে বেশ দুরবস্থায় পড়েছে বেচারি। সামহাউ কিছু রোজগার ওকে করতেই হবে। এম এ এম সি -তে স্টোরে ক্লার্ক ছিল। ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবার পর পুঁজি ভেঙে ভেঙে চালাচ্ছিল। বাড়িতে গ্র্যাজুয়েট মেয়ে রয়েছে, স্ত্রীরও খাটার ক্ষমতা যথেষ্ট। শুদু আপনার মতো একজনের রান্না নয়, সুরেনদা চাইছে অনেকগুলো ফ্যামিলির খাবার রেঁধে পৌঁছে দিতে। রান্নাটা এরা নিজেদের বাড়িতেই করবে, কারুর বাড়িতে গিয়ে করবে না। কিন্তু, এই এলাকায় আপনি ছাড়া এখনই আর কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। তো, একজন দিয়েই শুরু হোক। এখন বলুন, কী কী তরকারি আপনি চাইছেন, সেইমতো খরচাটা আন্দাজ করে সুরেনদা বলতে পারবে চার্জ কত পড়বে।'

—আমি এখানে এসেছি তিন মাস। টেলিফোনে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিই। তাতে চড়ে শপিং করতে যাই। সকালে, বিকালে যে ঝি

আসে তাকে মাঝে মাঝে রিকোয়েস্ট করে কিছু ভেজিটেবিল আনাই। নিজে তো ভালো করে হাঁটতেই পারি না। তো, কুকিং হ্যাজ বিকাম ইম্পসিবল ফর মি। ফরটি ইয়ার্স আগে যখন দুর্গাপুর ছাড়ি, তখন সর্ষে দিয়ে ইলিশ, মোচার ঘন্ট এসব মাঝে পেতে পারি? আপনার মিসেস কি এগুলো কুক করতে পারেন?

সুরেন একটু শুকনো হেসে বলে ওঠে, 'যখন এম এ এম সি বেঁচে ছিল, তখন আমার বাড়িতেও এসব প্রায়ই হত। আমার মিসেস বাঙাল মেয়ে, তাই রান্নাটা ভালোই জানে। এখন অনেকদিন আলু - পোস্ত, ডিমের ঝোল ছাড়া কিছু রাঁধেনি। তাই অত টেস্টি হবে কি না বলা যাচ্ছে না। তবে সবই পাবেন। কিন্তু, এসব তরকারি তো কস্টলি, তাছাড়া তৈরি করতে তো প্রচুর সময়ও লাগে। রোজই যদি এসব তরকারি—'

—ওঃ হো! আমার সিক্সটি এইট চলছে। আমার স্টমাকটাও খুব একটি হেলদি নয়। এগুলো হয়তো এক দু-বার খাব। তবে শাকটা আমার রোজই চাই। আর উইকে অ্যাট লিস্ট দু-দিন শুঁটকিমাছ। আসলে বহু বছর বিদেশে থাকার ফলে অনেক কিছু, অনেক কাল খাওয়া হয়নি। মাই ডেজ আর নাম্বারড। যে কোনোদিন চলে যেতে পারি। খাওয়া, টেলিফোন আর বইপত্তর ছাড়া আমার কোনো রিক্রিয়েশন নেই। আমার সামান্য কিছু টাকা আছে। আমার আর মিঠুর পক্ষে সেটা যথেষ্ট। এ বাড়িতে আমরা কেবল দুটি প্রাণী থাকি। সো, মিস্টার সুরেন! ইউ হ্যাভ টু বিয়ার উইথ মি।

একথার উত্তরে সুরেন, অবসৃত স্টোর ক্লার্ক, প্রকৃত প্রস্তাবে যে ফুড লাপ্পায়ার, বলে ওঠে, 'ওহ্ সিয়োর ম্যাডাম। প্লিজ গিভ মি অর্ডার হোয়াট এভার ইউ লাইক টু ইট। কিন্তু ম্যাডাম, কানানবাবু আমাকে বলেছিলেন শুধু আপনার খাবার পৌঁছে দিতে হবে। আপনি একা থানেক। কিন্তু মিঠু—?'

—মিঠু ইজ মাই সুইটহার্ট। না, ওর খাবার আপনাকে দিতে হবে না। ও আমার হাতে অ্যান্ড আমার এনে দেওয়া খাবার ছাড়া কিছু খায় না। অ্যান্ড, আই অ্যাম এনাফ ফর হার।

এপপর ওরা কথা চালিয়ে যেতে থাকে। আমাদের এই আখ্যানের অন্যতম চরিত্র তথা দেবাশিস, প্রকৃত প্রস্তাবে যে এই আখ্যানের রচয়িতাও বটে, তার কানে সে কথাগুলো ঢোকে না। যেহেতু সে উচ্চ ফলনশীল গল্পের খোঁজেই এখানে এসেছে, সেহেতু সে ভাবুক হয় — মিঠু কে? অমিয়ার মেয়ে? নাকি নাতনি? এই ড্রয়িংরুমে সে একবারও উঁকি দিল না কেন? এক কাপ চা কি এনে দেওয়া যেত না? নাকি বেচারি পঙ্গু? তাহলে তো ইস! ভদ্রমহিলার কী কষ্ট! কাননের কাছে সে শুনেছে ভদ্রমহিলা তিরিশ বছর ধরে টরেন্টোতে বাস করার পর দুর্গাপুরে ফিরে এসেছেন। দুর্গাপুরের বি-জোনে ডি এস পি -র কোয়ার্টার্সে থাকতেন। স্বামী ডি এস পি-র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ভদ্রমহিলার তেত্রিশ বছর বয়সে দুম করে প্ল্যান্টে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান ওনার স্বামী। ওঁদের ছেলে তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। ইনস্যুয়োরেন্স, প্ল্যান্ট থেকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ, সব মিলিয়ে ওনার পক্ষে বুদ্ধিমান ছেলেকে মানুষ করতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। ছেলে দুর্গাপুরে স্কুল - পরীক্ষাগুলো পাশ করার পর খড়গপুর আই আই টি - তে পড়ার সুযোগ পায়। কানাডার কোনো একটি শহরে ভদ্রমহিলার দিদি - জামাইবাবু তখন সেটল্ড্। আই আই টি থেকে পাশ করে বেরোনোর পর মা - ব্যাটা মিলে সোজা - কানাডার সেই শহর। ক্রমে টরেন্টো শহর ভদ্রমহিলা ও তাঁর ছেলের স্থায়ী ঠিকানা হয়ে ওঠে। ছেলের বিয়ে হয় একটি প্রবাসী বাঙালি মেয়ের সঙ্গে। ধীরে সুস্থে ওঁরা ওদেশের নাগরিকত্বও পান। তারপর? ভদ্রমহিলা এখানে চলে এলেন কেন? আসা মানে — মানুষ একমাস বা কিছুদিনের জন্য পুরোনো জায়গাতে আসতেই পারে। কিন্তু এভাবে বাড়ি - টারি কিনে ফেলে একা একা থাকতে শুরু করা —এ তো ফিরে যাবার লক্ষণ নয়। তাহলে কি ছেলেটাও ক-দিন বাদে চলে আসছে? না ক ভদ্রমহিলা আমৃত্যু একাই থেকে যাবেন? ছেলেটার কি মাকে নিয়ে পোষালো না? কানন এ প্রশ্নগুলোর উত্তর ঠিকঠাক জানে না। সে বলেছে, 'এসব সাংসারিক খুঁটিনাটি আমি জানতে চাইনি। ভদ্রমহিলা নিজে থেকে যা যা বলেছেন, সেগুলো তোমাকে বললাম। নিঃসঙ্গতা কতটা পীড়াদায়ক সেটা তোমার যারা লেখো - টেখো, তাদের দেখে নেওয়া উচিত মনে করেই এনার কথা তোমাকে বলা। ভদ্রমহিলাকে নিয়ে দু - মাস আগে ওঁদের পাড়ায় একটা ঝামেলা হচ্ছিল। আমি যেহেতু একটু পার্টি - ফার্টি করি, খবর পেয়ে যেতে হয়েছিল। সেই থেকে এনার সঙ্গে আমার আলাপ।'

—এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ঝামেলা? কী ঝামেলা?

—ভদ্রমহিলার বাড়ি যেতে মেইন রাস্তার ওপরে 'দুর্গাপুর সংস্কৃতি কেন্দ্র' নামে একটা ক্লাব আছে। একদিন যাবে দেখিয়ে দেব। ওই ক্লাবের নিয়ম হচ্ছে, ওই এলাকায় কেউ বাড়ি বিক্রি করলে সে দেবে পঁচিশ হাজার, আর যে ক্রেতা সে দেবে পঁচিশ। তা, সে পঞ্চাশ তো ক্লাব পেয়েই গেছে। এবার ওরা পাড়ার শনি মন্দিরের উন্নতিকল্পে আরও পঁচিশ হাজার চেয়েছিল। ভদ্রমহিলা দেননি। ক্লাবের ধারণা, বিদেশ থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে এসেছে, তার ওপর সঙ্গে লোকজন বা বলভরসা কিছু নেই, সুতরাং টাকা দিতে হবে। এদিকে ভদ্রমহিলার গোঁ, টাকা দেবেন না। তাই ভদ্রমহিলার বাড়িতে প্রথমে ঝি বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর রাতের বেলায় মাটি খুঁড়ে মাটির নীচে টেলিফোনের কেব্‌ল্ তার, এমনকী ওপরের তারও ছিঁড়ে দেওয়া হল। তারপর মোড়ের সবকটা ট্যাক্সিওলাকে বলে দেওয়া হল, ভদ্রমহিলা ডাকতে এলেও যাওয়া যাবে না।

—সে কী! ক্লাবের লোকেরা করল এসব? কারা এরা? তোমার পার্টির লোকর?

— না । এই এলাকাতে আমরা খুব উইক। সেজন্যে পুলিশ এসে স্টেপ নেওয়ার পর আমি গেছিলাম।

—পুলিশ কেন?

—ভদ্রমহিলা থানায় গিয়ে কমপ্লেন করেন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আসে। রাইটার্স থেকেও নাকি থানায় ফোন আসে। রাইটার্সে কে একজন ভদ্রমহিলার চেনা আছে।

— সে যাক গে। তুমি এসে কী করলে?

— আমি মানবিকতার কারণে এসেছিলাম। আসার আগে পার্টিকে বলেছিলাম সকলে মিলে যাতে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। তো, শালা ঘেন্না ধরে যায়। পার্টি কী বলল জান?

— কী?

— পার্টি ঠারেঠোরে জানাল, ভদ্রমহিলার জন্যে পার্টি কোনো বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংঘাতে যেতে রাজি নয়। আসল কথাটা হল, ভদ্রমহিলার ভোটার লিস্টে নাম নেই। উনি কোনোদিনই ভোট দেবেন না। তাই।

— মাই গড!

— হ্যাঁ, ভাই। আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি!

— তো, তুমি এসে কী করলে?

— কিছু না। যা করার পুলিশ করে গেছে। ক্লাবে শাসিয়ে গেছে। আমি শুধু মর‍্যাল সাপোর্টটা দিতে আসি। ক্লাবের ছেলেগুলো বাঁকা চোখে তাকায়।

—হ্যালো, মাই ডিয়ার বয়! হোয়াট আর ইউ থিংকিং?

অমিয়া চৌধুরী, আমাদের এই আখ্যানের অন্যতম চরিত্র, প্রকৃতপ্রস্তাবে যাঁর নিঃসঙ্গতাই আমাদের এই আখ্যানের মূখ্য আকর্ষণ, তাঁর প্রশ্নে দেবাশিস তথা আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে।

—না, আপনার কথাই ভাবছিলাম। কানাডা একটা উন্নত দেশ । সেখান থেকে চলে এলেন কেন?

— কেন এলাম? অমিয়া হেসে ওঠেন। তোমাদের মুখে এই 'মাসিমা' ডাকটা শোনার জন্যে।

এসব কথার উত্তরে একটু হাসতে হয়। তাই দেবাশিস অথবা সুরেন বকশি হেসেই বলে

—ইউ মাস্ট বি জোকিং।

—আই অ্যাম ভেরি সিরিয়াস। ওখানে এভরি ওয়ান, ইভন আমার ছেলের বন্ধুরা পর্যন্ত আমায় নাম ধরে ডাকত।

— হ্যাঁ —। সেটা পড়েছি কাগজে। কিন্তু তিরিশ - পঁয়ত্রিশ বছরে এতে তো আপনি অবশ্যই হ্যাবিচ্যুয়েটেড হয়েই গেছিলেন। তাহলে হঠাৎ করে এই বয়সে চলে এলেন, একা, আপনার ছেলেও কি কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসছে?

— নাঃ। সে কেন আসবে? সেখানে সে সেটল্‌ড্। গাড়ি, বাড়ি, ইন্ডিয়ান মানিতে তার স্যালারি বোধহয় দু- লাখের বেশি। এখানে সে আসবে না।

— আপনি একা থাকবেন এখানে?

— টিল ডেথ। তাছাড়া একা কোথায় ? মিঠু আছে না?

—মিঠু কে?

অমিয়া রহস্যজনক ভঙ্গিতে হাসেন। বলে, 'গেস ইট মাই বয়। ইমাজিনেশন ছাড়া রাইটার হওয়া যায় না। আচ্ছা, কী লেখ তুমি? পোয়েট্রি?'

এ কথায় দেবাশিস বাস্তবিক লজ্জা পায়। বলে, 'আঃ! ছাড়ুন তো মাসিমা। আমার সম্পর্কে কাননের কিছু বলার নেই, তাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছে। রাইটার হবার যোগ্যতা আমার নেই। এখন তো প্রচুর পত্রিকা, তাই একটা দুটো ম্যাগাজিনে আমার দু-চারটে গল্প ছাপা হয়েছে।'

—তা! আমার পোয়েট্রি ভালো লাগে না। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাইকেলের পর ইন ফ্যাক্ট আমি কোনো পোয়েট্রি পড়িওনি। মাসে দু-বার লাইব্রেরিতে যাই। অনেক রিকোয়েসট করার পরে দুটা করে বই আনতে দিচ্ছে। পাঁচ - ছ - দিনে শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা, আমি যে এভরি অলটারনেটিভ ডায়ালগ ইংরেজিতে বলছি, তোমরা কিছু মাইন্ড করছ না তো? আই অ্যাম ট্র্যায়িং টু স্পিক কনটিনিউয়াসলি ইন বেঙ্গলি, বাট হচ্ছে না। আসলে লাস্ট টু ইয়ার্স আমি বেঙ্গলিতে কোনো সেন্টেন্স বলিনি তো।

—মানে? বাড়িতে ছেলে - বউমা - নাতি এদের সঙ্গে কথাবার্তা কি ইংরেজিতেই হত?

—বাড়িতে থাকলেও এরা আমাকে কমপ্যানি দেবার সময় পেত না। অ্যান্ড, লাস্ট টু ইয়ার্স আই ওয়াজ ইন এ হোম ইন টরোন্টো।

— মানে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। টরেন্টোতে হোমেই তো থাকতেন আপনি। হোটেল বা গাছতলাতে তো নয়।

— আই থিং, ইউ ডোন্ট নো হোয়াট এ হোম ইজ। হোম তো বাড়িই, তবে দিস হোম ইজ মেইনটেইনড অ্যান্ড গভর্নজ বাই দ্য গভর্নমেন্ট। ইচ অ্যান্ড এভরি সিনিয়ার সিটিজেন হু হ্যাজ অ্যাটেইনড দ্য এজ অব সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ক্যান স্টে দেয়ার।

—ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

—'হোম' হচ্ছে একটা বৃদ্ধাশ্রম। সিক্সটি ফাইভ বয়েসের বিলো - দ্য-পভার্টি-লাইনের মানুষ হোমে গিয়ে থাকতে পারে। তার থাকা - খাওয়া - চিকিৎসা - এনটারটেনমেন্ট সমস্ত কিছু উইল বি প্রভাইডেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট।

সুরেন বকশি বলে ওঠে, 'তাই নাকি? আপনি যে আজব দেশের কথা বলছেন! চাকরি থেকে রিটায়ার্ড হলে বা আমার মতো চাকরি চলে গেলে হোমে গিয়ে থকলেই হবে? স্ত্রীকেও নিয়ে গিয়ে থাকা যায়? খাওয়া - পরা- চিকিৎসার কোনো চিন্তা নেই? সরকার দেবে? যে খুশি গিয়ে থাকতে পারে?'

—যে কেউ নয়। হি আর শি মাস্ট বি দ্য সিটিজেন অব ত্যাট কান্ট্রি। সেকেন্ড থিং হচ্ছে, তার বয়েস সিক্সটি ফাইভ হতেই হবে। থার্ড, তার ইনকাম, আই অ্যাম নট সিয়োর অ্যাবাউট দ্য অ্যামাউন্ট, পার ডে বিলো থ্রি ডলার হতে হবে। আমি তিনটে ক্রাইটেরিয়াই ফুলফিল করি, তাই আই হ্যাগ গট এ চান্স টু স্টে অ্যাট হোম।

— তো, এরকম তো লক্ষ লক্ষ বুড়োবুড়ি থাকবে একটা দেশে। তাদের সবার দায়িত্ব সরকারের?

— সেই বুনো বা বুড়িটা তো নেশনের ডেভেলপমেন্টে ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি কিছু না কিছু কনট্রিবিউট করেছে। তার যাতে পিসপুল ডেথ হয়, সেটা সরকার দেখবে না?

সুরেন বকশি যেন কিছু গন্ধ পেয়ে গেছে। সে প্রায় চিৎকার করে বলে ওঠে, 'এদেশের সরকারের অ্যাটিটিউডটাই ঠিক উলটো। যারা অফিসে, কলকারখানায় কাজ করে তারা রাষ্ট্রের চোখে প্রোডাক্টিভ সিটিজেন। আমার মতো যাদের চাকরি গেছে, যারা বেকার, তারা নন - প্রোডাক্টিভ সিটিজেন। রাষ্ট্রের বোঝা — রাষ্ট্রের কাছে অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা। আমাদের জন্যেই গ্রাস ন্যাশনাল ইনকাম বাড়তে পারছে না। দেশটা উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশ হয়ে উঠতে পারছে না।'

আলোচনা অন্য খাতে বইতে চলেছে দেখে দেবাশিস তথা প্রোডাক্টিভ সিটিজেন বলে ওঠে, 'যাকগে, সেসব তো আছেই

সুরেনদা, আজ বরং আমরা ওদেশের গল্প শুনি। তো, মাসিমা, আপনি হোমে এলেন কেন? টরেন্টোতে আপনার ছেলের বাড়িতে না থেকে হোম? আমাদের দেশেও ইদানীং বৃদ্ধাশ্রম - কালচার খুব পপুলার। ছেলের বউয়ের সঙ্গে পোষায় না বলে। আপনারও কি তাই? কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার ঘনিষ্ঠ হতে চাইছি বলেই এটা জিজ্ঞেস করলাম।

— ওয়ান ফাইন মনিং - এ আমি ডিসকভার করলাম, আই হ্যাভ বিকাম এক্সেস ইনম মাই সনস্ ফ্যামিলি। হ্যাঁ, নন - প্রোডাক্টিভ মেম্বারও বলতে পার। দেন আই ডিসাইডেড টু স্টে অ্যাট হোম।

— তো, হোমের এত আরাম ছেড়ে এখানে এলেন কেন?

উত্তরে, অমিয়া ঘড়ি দেখে ব্যস্তসমস্তভাবে বলে উঠলেন, 'এক্সকিউজ মি। মিঠু অনেক্ষণ আন - অ্যাটেন্ডেড পড়ে আছে। ওকে একটু জল আর হালকা টিফিন দিয়ে আসি। নাহলে আবার ওর অভিমান হবে। একটু বসো প্লিজ। উইদিন ফাইভ মিনিটস আমি আসছি।'

অমিয়া চলে যেতে দেবাশিস ফিসফিসিয়ে কাননকে জিজ্ঞেস করে, 'মিঠু কে?' কানন কাঁধ নাচায়। সুরেন বলে ওঠে, 'যেই হোক, সে আমার কাছ থেকে খাবার কিনে খাবে না। তাহলে কাননদা, ভদ্রমহিলা যা বললেন, পনেরো দিন না গেলে আমি বুঝতে পারব না সারা মাসে কত খরচা পড়বে। ওনার কথামতো পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে কাজটা শুরু করি, তারপর দেখা যাক বরাবরের জন্যে আমার বা ওনার পোষায় কি না।'

কানন তথা প্রোডাক্টিভ সিটিজেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের এই আখ্যানের ভিন্নধর্মী চরিত্রগুলির মধ্যে সংযোগসেতু মাত্র, খুব সতর্ক ভঙ্গিতে উত্তর দেয়, 'আমি কিছু বলব না। আমার কাজ ছিল যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। দিয়েছি। পরে আপনার কাছ থেকে কি মাসিমার কাছ থেকে কোনো কথা আমি শুনতে রাজি নই। আপনার মেয়েকেও আমি বিউটি - পার্লারে ঢুকিয়ে দেব। সেখানেও সেই একই কথা। বুঝে নাও, করবে কি না। মন্দ ভালো কোনো কিছুরই আমি দায়িত্ব নেব না।'

দেবাশিস অবাক হয়ে তার সহকর্মীর কথা শুনছিল আর মনে মনে কাননকে গাল দিচ্ছিল, শালা, পারিস বটে! এত সব করার কী আছে? ব্যাঙ্কে কাজ করিস, বেতনটা গ্যারেন্টেড, খা দা, অফিস কর, মন দিয়ে ছেলেমেয়ে মানুষ কর। সময় কাটছে না তো টিভিতে বা হলে গিয়ে সিনেমা দেখ। গল্প - উপন্যাস পড়। সুন্দর সময় কেটে যাবে। শালা, সাহিত্যবোধ না থাকার ফলেই মানুষ এসব লাফড়ায় জড়ায়। পরে দু-পক্ষেরই গাল খায়। সময় কীভাবে ইউজফুলি কাটাতে হয়, সেটা জানতে হয়। ইউজ ফুলি সময় কাটানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সাহিত্য পাঠ — সাহিত্য চর্চা।

দেবাশিস ভাবুক হয়। ফলে এ সময় কানন আর সুরেন মূকাভিনয় করতে শুরু করে। ড্রইংরুমের জানালা গলে একসময় 'চলবে না', 'চলবে না' মিছিলের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে স্পষ্টতর হয়ে প্রবেশ করে। মূকাভিনয় এতে পাঁচ সেকেন্ডের বিরতি পায়। ভোটার লিস্টের কারচুপিতে কার 'কালো হাত জড়িত' কি জড়িত নয়, এতে মূকাভিনেতাদের কিছুই যায় আসে না। তাই মূকাভিনয় আবার শুরু হয়।

অমিয়া চৌধুরী ঘরে ঢোকেন। পাঁচটা চকচকে একশো টাকার নোট সুরেন বকশির হাতে দিয়ে বলেন, 'ফাইভ হান্ড্রেড দিলাম। তাহলে সুরেন, কাল থেকে আমি টেনশন - ফ্রি থাকছি অ্যাবাউট মাই ফুডস। ওকে?'

সুরেন ঘাড় নাড়ে। টাকাটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে, 'তাহলে মাসিমা, কাল সকালে আপনার চা আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে হাজির হচ্ছি।'

সুরেন যাবার উদ্যোগ করতেই দেবাশিস বলে ওঠে, 'একন আপনি যেতে চাইলে তো হবে না। আমরা যে যার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম। আমি এখানে বসে বসে একটা আখ্যান লেখা শুরু করেছি। তাতে আপনিও একটা চরিত্র। আখ্যান তো এখনও শেষ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তো আপনার একটা হয় অ্যাক্টিভ নয় প্যাসিভ ভূমিকা থাকছে। বসুন।'

সুরেন ভুরু কঁচকে বলে ওঠে, 'দূর মশাই আখ্যান! আমি এখন চিন্তায় আছি মাসিমার কাল সকালের ব্রেকফাস্ট নিয়ে। দুটো ভালো সাইজের সিঙ্গাপুরি কলার দাম বলুন তো? ছ-সাত মাস কলা কিনিনি। দামটা না জানলে ঠকে যাবার চান্স আছে। লাভের গুড় পিঁপড়েতে খেয়ে নেবে তাহলে।'

ব্যক্তিত্ব নেই তাই বোধহয় সুরেনকে দেবাশিস ধমকেই বলে, 'আপনি এখন কী করবেন, কী ভাববেন, সব ঠিক করব আমি।'

সোফা থেকে উঠে পড়ে দরজার কাছে পৌঁছেই গেছিল সুরেন। সেখান থেকে ঘাড়টা পুরো নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে বলল, 'তাই?'

—হ্যাঁ।

সুরেন লম্বা লম্বা পা ফেলে চোখ বড়ো বড়ো করে দেবাশিসের দিকে এগিয়ে এল। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি এনে দেবাশিসের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তাহলে আমারও একটা শর্ত আছে। আপনার এই ঘোড়ার ডিমের আখ্যানের শেষে বর্তমান জীবনটা পালটে দিতে হবে। যেমন ধরুন, আমার এই ফুড-সাপ্লাইয়ের ব্যবসা এমন ফুলে ফেঁপে উঠল যে আমি চার - পাঁচ জন কর্মচারী রাখছি অথবা এমন হল যে দেশের সরকার এম এ এম সি সহ বন্ধ কারখানাগুলো নতুন করে বাঁচিয়ে তুলল। রাজি? পারবেন?'

দেবাশিস ভুরু কুঁচকে বল, 'তার মানে ইচ্ছাপূরণের গল্প? তা কী করে হয়? তবে এমনও তো হতে পারে যে, এই আখ্যানের শেষে আপনি, আমি, সবাই বাঁচার একটজা অন্যরকম অর্থ পেয়ে গেলাম। যাগ গে, এখন আপনার ভূমিকা চুপ করে বসে থাকা। বসুন।'

সুরেন বসলে দেবাশিস অর্থাৎ আমি বললাম, 'মাসিমা, কিছু মনে করবেন না, আপনার চলে কীসে?'

—মাসে টু হান্ড্রেড ডলার আসে যে।

— কানাডা থেকে প্রতি মাসে দুশো ডলার ঠিকঠাক আসে? মানে এত দূরত্ব পেরিয়ে? কে পাঠায়? ছেলে?

— ছেলের কাছে চাইলে নিশ্চয় পাঠাবে। টু হান্ড্রেড ডলার ইজ এনাফ ফর মি। এটা কানাডিয়ান গভনমেন্ট দেয়।

— কেন?

— আমি তো কানাডার সিনিয়ার সিটিজেন। হোমে থাকি না। সেজন্য।

— সে কী কথা? আপনি ওদেশে থাকলে না হয় সরকার দায়িত্ব নিল। কিন্তু ওদেশে থাকছেন না অথচ সরকারি সাহায্য — আপনি সত্যি বলছেন তো? আপনার মতো তো অনেকেরই ইচ্ছা হতে পারে কানাডার সিটিজেনশিপটা রেখে জন্মভূমিতে শেষ জীবনটা কাটানোর। সবাইকার জন্যেই সরকার মাসে দশ হাজার টাকা খরচ করবে?

— করেই তো। সো ফার মাই নলেজ গোস, দেয়ার আর থাউজ্যান্ডস অফ পিপল যারা কানাডার বাইরে থাকছে। সবাইকার জনেও টু হান্ড্রেড ডলার, তবে ফর দোস হু আর বিলো দ্য পভার্টি লাইন।

— মাই গড! আপনি প্রতিমাসে পাচ্ছেন ? কে দিয়ে যায়?

— পোস্টম্যান। ট্যাক্সি ভাড়া করে স্টিল প্ল্যান্টের কাছে স্টেট ব্যাঙ্কে যাই। জমা দিই।

সুরেন বকশি বলে ওঠে, 'এ দেশের সরকার কোনো সিটিজেনের জন্যই কিছু করে না। মালটিন্যালনাস কোম্পানিগুলোর জন্যে শুধু বাজার তৈরি করে।

দেবাশিস ধমকেই বলে ওঠে, 'সুরেনদা, এখন আপনার ভূমিকা চুপ করে বসে থাকা। কথা বলবেন না।'

অমিয়া বলে ওঠেন, 'উই হ্যাভ টু প্লে আওয়ার রোল পারফেক্টলি সুরেন। দেবাশিস, তোমার নেক্সট কোর্স অব অ্যাকসন কী?'

— আপনার এই মিঠু সম্পর্কে জানলেই আমার ডিউটি শেষ। হু ইজ মিঠু?

— মিঠু ইজ মাই কমপ্যানিয়ন, মাই লাভ, মাই অল। চলো, ওর সাথে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।

ওরা তিনজনে অমিয়ার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল। একটা সিঙ্গল বেডের খাট, একটি ছোটো টেবিল, তার ওপর একটা ছোটো টেবিল ল্যাম্প ছাড়া কিছু নজরে পড়ল না। কোথায় মিঠু? অমিয় ডাকলেন, 'মিঠু? কোথায় গেলে? কাম হেয়ার। হেয়ার আর সাম গেস্টস হু লাইক টু বি ইনট্রোডিউসড ইউথ ইউ। বেরিয়ে এসো নটি গার্ল।'

একটা 'কী-ঈ-ঈ-চ্' টাইপের শব্দ খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে ওরা একটু চমকে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাটের তলা থেকে একটা কাকাতুয়া গট গট করে বেরিয়ে ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর ছোট্ট একটা উড়াল দিয়ে অমিয়ার কাঁধে এসে বসে। অমিয়া কাকাতুয়াটার মাথায় আলতো চাপড় মেরে বলেন, 'দে আর ওয়েটিং ফর লং টু বি ইনট্রোডিউসড উইথ ইউ। দিস ইজ কানন, অফ হুম আই টোল্ড ইউ বিফোর। এ হচ্ছে সুরেন, এ দেবাশিস।' কাকাতুয়াটা একদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে যেন ওদের জরিপ করছিল। অমিয়া বলেন, 'ওয়েল জেন্টালমেন! এ হচ্ছে মিঠু।'

কানন হাঁ করেই ছিল। বলল, 'এটাকে কোথায় পেলেন? এখানে এসে পুষেছেন নাকি? জানতাম না তো!'

অমিয়া বলেন, 'ওটাকে নয়, বলো ''ওকে''। সি অলসো হ্যাজ ফিলিংস টু শেয়ার উইথ মি। ও টরোন্টোতেই একটা হোমে থাকত। ওদেরও হোম টাইপের একটা ইনস্টিটিউট মতো আছে। সেখানে ওদের ট্রেইনড করা হয়। কীভাবে একজন ভালো ''পেট'' হয়ে উঠতে হয়, সে বিষয়ে। তারপর সে সমস্ত হিউম্যান বিয়িং ওদের ''পেট'' হিসাবে নিতে চায়, তাদের কাছে বিক্রি করা হয়। আমি ওকে আমার হোমে থাকার সময়টাতে কিনি। ওর সাথে কথা বলে সময় কাটত। ও আমাকে বোঝে। আমার সা ফারিংস শেয়ার করে।'

স্তম্ভিত দেবাশিসের মুখ দিয়ে বেরোয়, 'উড়ে পালায় না? চেন দিয়ে তো বাঁধা নেই দেখছি!'

— নাঃ। ছোটো থেকে ওদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। বোধহয় দু - বার মতো ওর ডানাও ছাঁটা হয়ে গেছে, আমি কেনার আগে। একটু ছোট্ট করে উড়তে পারে কেবল। এই চার দেয়ালের বাইরে তো খোলা আকাশ, ও কিন্তু সেখানে যাবার জন্যে ছটফট করে না। ওকে ছোটো থেকে অ্যাডাপ্ট করে নেওয়ার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে।

কানন বলল, 'এখানে নিয়ে এলেন কী করে? ইমিগ্রেশন না কী যেন বলে, ওরা আটকায়নি?'

দমদম এয়ারপোর্টে এসে মিঠুকে পাই। ও অন্য অন্য 'পেট' দের সঙ্গে এসেছে।

কথা বলা বারণ ছিল, তবু সুরেন বলে ওঠে, 'তা এত হাঙ্গামা করতে গেলেন কেন? এখানে এসে একটা অ্যালসেসিয়ান কি স্প্যানিয়েল পুষতেন। সঙ্গী কে সঙ্গী হল আবার রাতে চোর ডাকাতের দুর্ভাবনা থেকে নিশ্চিন্তিও রইল।'

— আমি যে ওর সঙ্গে আমার মিল খুঁজে পাই।

— মানে?

— মিঠুও তো ছোটোবেলায় উড়তে চাইত। সারকামস্ট্যানসেস ওকে বাধ্য করেছে ওর ডানা ছাঁটাতে, ওরা ভুলে যেতে। আমিও তেমনি চেয়েছিলাম, নিজের ছেলের কাছে, বউমার কাছে, নাতির কাছে খুব আপন হয়ে থাকব। হল না তো! আমি টরেন্টোর হোমে নিজেকে অ্যাডাপ্টেড করে নিতে পারিনি, কেননা তখনও আমার সাধ বা আশাগুলোর ডানা ছাঁটা হয়নি। প্রতি উইক - এন্ডে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। এই আশায় যে, ছেলে এসে বলবে, 'মা চলো। তোমাকে ছাড়া বাড়িতে ভালো লাগছে না।' ছেলে আসেনি। তাই একটু একটু করে আমার ডানার পালক ছিঁড়ে ফেলেছি। এখন ... ... — ওনলি মিঠু আমাকে বোঝে, বা আমি মিঠুকে। আমরা দুজনেই উড়তে চাই না।

গলা আগেই জড়িয়ে গেছিল। এ পর্যন্ত বলে অমিয়া কান্নায় ভেঙে পড়েন।

তিনটি মানুষ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

খানিক পরে রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে সুরেন দেবাশিসকে বলে, 'বুঝলেন দাদা! আপনার ওই সব আখ্যান লেখা বা আমার জীবন পালটে নওয়া, সব কিছুই অর্থহীন। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারাটাই একটা আশ্চর্য ঘটনা, তাই না?'

কানন বলে, 'হ্যাঁ, মানছি। তবুও আমি আপনার মেয়ের জন্যে কাল বিউটি পার্লারে যাব। কেননা সব সময়েই ভালোভাবে বেঁচে ওঠার চেষ্টা করা উচিত।'

দেবাশিস গম্ভীর হয়েই হাঁটছিল। সে শুধু বলে, 'অন্য কিছু না ... । কাকাতুয়াটার জন্যই কষ্ট! ... তাছাড়া ... এভাবে ভাঙতে ভাঙতেও তো মানুষ একটা তুচ্ছ অবলম্বন নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর, কোনো কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা তো করছে!'